প্রথম আলো গোলটেবিল বৈঠক

‘শেয়ারবাজার কোন পথে’

১৯ জানুয়ারি *প্রথম আলো*র উদ্যোগে ‘শেয়ারবাজার কোন পথে’ শীর্ষক গোলটেবিল বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। এতে সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞরা আলোচনায় অংশ নেন। তাঁদের বক্তব্য সংক্ষিপ্ত আকারে ছাপা হলো।

গোলটেবিল বৈঠকে বক্তারা

আলোচনা

মতিউর রহমান

*প্রথম আলো*র পক্ষ থেকে বিভিন্ন সময় রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিকসহ বিভিন্ন বিষয়ে আমরা এ ধরনের আলোচনার আয়োজন করে থাকি। এর ফলে মানুষের কাছে কিছু বলা কিংবা এসব বিষয়ে তাদের সচেতন করে তোলা যায়।

আমাদের আজকের গোলটেবিল বৈঠকের শিরোনাম দিয়েছি ‘শেয়ারবাজার কোন পথে’। শেয়ারবাজারের এখন যে পরিস্থিতি, তাতে আমাদের সবারই জানা প্রয়োজন, কোন পথে যাচ্ছে শেয়ারবাজার। অনেক দিন ধরেই বাজার স্বাভাবিক আচরণ করছিল না। বাজারে ভালো ও নতুন শেয়ারের সরবরাহ ছিল কম, অথচ লাফিয়ে লাফিয়ে বেড়েছে বিনিয়োগকারীর সংখ্যা। এ কারণে বাজার অতিমূল্যায়িত হয়ে পড়ে। আবার এই বাজার থেকে যেকোনো উপায়ে টাকা তুলে নেওয়ার ঘটনার কথাও শুনি আমরা।

আমরা একটা স্বাভাবিক ও স্থিতিশীল শেয়ারবাজার চাই। এক দিনে সূচক ৬০০ পয়েন্ট কমে যাওয়া যেমন স্বাভাবিক নয়, আবার একদিনে এক হাজার পয়েন্ট বেড়ে যাওয়াও স্বাভাবিক নয়। সুতরাং এখন বড় প্রশ্ন হচ্ছে, শেয়ারবাজার কোন পথে এবং সঠিক পথে আনতে হলে কী করতে হবে। শেয়ারবাজারের এই অস্বাভাবিক আচরণে হঠাৎ হঠাৎ লেনদেন বন্ধ করে দেওয়া হচ্ছে।

শেয়ারবাজারকে সঠিক পথে আনতে বা এটি যেন সত্যিকার অর্থে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন সাধন করে এবং সাধারণ, মধ্যবিত্ত বা যেকোনো বিনিয়োগকারীর স্বার্থ রক্ষা করে, সে জন্য কী করা প্রয়োজন? আপনারা যাঁরা বিশ্লেষক আছেন, তাঁদের পরামর্শ কী? সেগুলো দেশবাসীকে জানানোর মাধ্যমে তাদের সচেতন করতে পারি। এটিই আজকের আলোচনার মূল উদ্দেশ্য।

এমন নয় যে শেয়ারবাজারের পতন এবারই আমরা প্রথম দেখলাম। ১৯৯৬ সালের শেয়ারবাজারের কেলেঙ্কারির কথা আমাদের অনেকেরই মনে আছে। মামলা-মোকদ্দমা ও জামিন হলো, কিন্তু তিনটি সরকার চলে গেলেও সেই ঘটনার এখনো বিচার হয়নি। ফলে বাজারে যা ইচ্ছা করে পার পাওয়া যাবে, এমন একটি ধারণা তৈরি হয়েই আছে। এ অবস্থায় বাজার নিয়ন্ত্রণ করা কতটুকু সম্ভব, সে প্রশ্ন থেকেই যাবে। ১৯৯৬ সালে যাঁরা দায়ী বলে অভিযুক্ত ছিলেন, তাঁদের সম্পর্কে কথা বলতে হবে। এসব চিহ্নিত অভিযুক্ত ব্যক্তিকে শাস্তির মুখোমুখি করার ব্যাপারে সরকারের ওপর চাপ সৃষ্টি করতে হবে।

বাজার কারও নিয়ন্ত্রণে নেই। নিয়ন্ত্রক সংস্থা এখন আপ্রাণ চেষ্টা করছে। কিন্তু বাজারের পরিস্থিতি স্বাভাবিক হচ্ছে না। আস্থা পাচ্ছেন না বিনিয়োগকারীরা। অথচ শেয়ারবাজারের প্রতি আস্থা ফেরানো জরুরি। কেননা এর সঙ্গে কেবল অর্থনীতিই জড়িত নয়, ৩৩ লাখের বেশি বিনিয়োগকারী যুক্ত হয়েছেন শেয়ারবাজারের সঙ্গে। এর মধ্যে অনেক মধ্যবিত্ত ও সাধারণ লোকও যুক্ত হয়ে পড়েছেন। সুতরাং এর সঙ্গে দেশের সার্বিক পরিস্থিতিও জড়িত হয়ে পড়েছে।

দেশের রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজ, সরকার, বিরোধী দল—সবাইকে নিয়েই দেশ। আমরাও এর মধ্যে আছি। স্বাধীনতার ৪০ বছর পূর্তি উপলক্ষে আমরা ইতিমধ্যে বিভিন্ন অনুষ্ঠান, বক্তব্য, আলোচনা, উদ্‌যাপন শুরু করেছি। আমরা জানি, গত ৪০ বছরে বাংলাদেশের অনেক অনেক অর্জন রয়েছে। আবার অনেক সমস্যা আমরা নিজেরা সৃষ্টি করেছি। অনেক সমস্যা বৃদ্ধি করে চলছি। আমরা সাধারণভাবেই বুঝি, রাজনৈতিক সরকার বা রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা, সংসদকে কার্যকর করা যদি না হয়, তাহলে শুধু একটি ক্ষেত্রে অগ্রগতি, অন্য ক্ষেত্রে অধোগতি—এ রকম হয়তো হতে থাকবে। সেসব বিষয়ে আমাদের পাঠকদের জন্য আপনারা কিছু বলবেন আজকের আলোচনায়। *প্রথম আলো*র পক্ষ থেকে সবাইকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি আলোচনায় উপস্থিত হওয়ার জন্য। আলোচনার শুরুতে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সাবেক অর্থ উপদেষ্টা ও এসইসির সাবেক চেয়ারম্যান এ বি মির্জ্জা আজিজুল ইসলামকে অনুরোধ করব বলার জন্য।

এ বি মির্জ্জা আজিজুল ইসলাম

*প্রথম আলো*কে ধন্যবাদ জানাচ্ছি আজকে এ ধরনের একটি আলোচনা আয়োজনের জন্য। আলোচনার বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এই পরিপ্রেক্ষিতে যে সম্প্রতি শেয়ারবাজার আবারও অস্বাভাবিক আচরণ করছে। আমি এই শেয়ারবাজারের সঙ্গে একসময় সম্পৃক্ত ছিলাম। বর্তমানে যে অস্থিরতা বিরাজ করছে শেয়ারবাজারে, তা বিশ্লেষণ করতে গেলে আমাদের সাম্প্রতিক অতীত ইতিহাসের দিকে লক্ষ করতে হবে। সে ইতিহাসটি হচ্ছে, প্রায় দুই বছর ধরে বাজারের সূচক ক্রমশই ঊর্ধ্বগতির দিকে এবং তা বেশ ত্বরিত গতিতেই এগিয়েছে। ২০০৮ সালের ডিসেম্বরে ইনডেক্স বা সূচক ছিল দুই হাজার ৭৯৫; ২০০৯ সালের ডিসেম্বরে এটি দাঁড়িয়েছিল চার হাজার ৫৩৫ এবং ২০১০ সালের শেষে এসে এটি প্রায় দ্বিগুণ হয়ে দাঁড়িয়েছে আট হাজার ২৯০। পরবর্তী সময় এক দিনে ৯ জানুয়ারি ২০১১ সালে সূচকের প্রায় ৬০০ পয়েন্ট পতন ঘটে। সেদিন সূচক নেমেছিল সাত হাজার ১৩৫। তার পরের দিনও প্রায় ৬০০ পয়েন্ট সূচকের পতন ঘটে দাঁড়িয়েছিল ছয় হাজার ৪৯৯। এসইসি ও বাংলাদেশ ব্যাংকের কিছু সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে তার পরদিন প্রায় এক হাজার পয়েন্ট বেড়েছে।

২০১০ সালের ৫ ডিসেম্বরে সর্বোচ্চ সূচক উঠেছিল আট হাজার ৯১৮ পর্যন্ত। এই যে ঊর্ধ্বগতিটি ছিল, তার পেছনে বেশ কয়েকটি কারণের সংযোগ ছিল বলে আমি মনে করি। এর মধ্যে সরকারি যে সঞ্চয়পত্রগুলো ছিল, তার ওপর করারোপ করা বা ফিক্সড ডিপোজিট ও সেভিং ডিপোজিটের ওপর ব্যাংকগুলোর সুদের হার কমানো উল্লেখযোগ্য। এ ছাড়া কালো টাকা শেয়ারবাজারে বিনিয়োগ করার সুযোগ দেওয়া এবং ব্যক্তিগত বিনিয়োগকারীদের ক্যাপিটালের ওপর ট্যাক্স দেওয়ার যে প্রস্তাব ছিল, বাজেটে তা পরে তুলে নেওয়া হয়। একই সঙ্গে প্রচুর নতুন বিনিয়োগকারী এসেছেন শেয়ারবাজারে। এঁরা হচ্ছেন তথাকথিত বিনিয়োগকারী, যাঁদের উদ্দেশ্য হলো, ‘আমি আজকে বাজারে ঢুকব এবং দুই দিন পর একটা বিরাট অঙ্কের টাকা লাভ করব।’ এটিকে সহায়তা করেছে স্টক এক্সচেঞ্জের ব্রোকার হাউসগুলো, যাদের প্রায় ২৭০টি শাখা অফিস বেড়েছে গত এক বছরে। মোট ৬১৩টি ব্রোকার হাউস রয়েছে। দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে যেসব বিনিয়োগকারী স্টক মার্কেটে এসেছেন, তাঁদের বেশির ভাগই বিনিয়োগের ঝুঁকি বা কী সূচকের ভিত্তিতে স্টক মার্কেটে বিনিয়োগ করা দরকার, সে সম্পর্কে ধারণা নেই। সব মিলিয়ে একটা হার্ড ‘বিহেভিয়ার’ সৃষ্টি হয়েছে। কিছু লোক শেয়ার কিনতে শুরু করলেন, দেখা গেল তাঁরা লাভ করেছেন। তখন সবাই কিনতে শুরু করলেন। পরে একটা পর্যায়ে গিয়ে তাঁরা বুঝবেন, আমি যে দামে কিনেছি, তার চেয়ে বেশি দাম হওয়ার সম্ভাবনা কম। কারণ, যে মূল্য দিয়ে যে কোম্পানির শেয়ার কেনা হয়েছে, তার ফান্ডামেন্টালের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক নেই। এর ফলে যে পতনটি হয়েছে, সেটি মোটেও অপ্রত্যাশিত নয়। আমরা যাঁরা বিশ্লেষক আছি, তাঁরা সবাই বলেছি, বাজার অতিরিক্ত মূল্যায়িত হয়েছে। ফলে একটি উদ্বেগজনক পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু বিনিয়োগকারীরা এ বিষয়গুলোর দিকে নজর দেননি। দুঃখের বিষয় হচ্ছে, প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগকারীরাও ব্যক্তিগত বিনিয়োগকারীদের মতো আচরণ করেছে। কিন্তু বাজার যে পরিস্থিতিতে পৌঁছে গিয়েছিল, সেখানে তারাও কিছুটা দায়ী ছিল। তাদের দিয়ে জোর করে শেয়ার ধরে রাখার মতো খুব বেশি যৌক্তিকতা ছিল না। তারা বিশ্লেষণ করলে দেখতে পাবে, যে দামে তারা শেয়ার কিনেছে, তা ধরে রাখলে তাদের ক্ষতি হওয়ার আশঙ্কা থেকে যাবে, ফলে তারাও বিক্রি করেছে।

নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থা বিশেষ করে, সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন ও বাংলাদেশ ব্যাংকের ভূমিকা ছিল দ্বিধান্বিত বা বিপরীতমুখী। যখন শেয়ারবাজারের সূচক বাড়ছিল, তখন এসইসি কিছু রক্ষণাত্মক সিদ্ধান্ত নিল। যেমন—মার্জিন কমাল, ইনডিভিজুয়্যাল (ব্যক্তিগত) ক্রেডিট লিমিট কমাল বা মার্চেন্ট ব্যাংকারদের ক্রেডিট লিমিট কমিয়ে দেওয়া হলো। আবার যখন বাজারের দরপতন হলো, তখন এসব সিদ্ধান্ত শিথিল করা হলো। বাংলাদেশ ব্যাংক একপর্যায়ে বলল, ব্যাংকগুলোর এক্সপোজার বেশি হয়ে গেছে স্টক মার্কেটে এবং শেয়ারবাজারে বিনিয়োগ একটি ঝুঁকিপূর্ণ বিনিয়োগ। সুতরাং ১০ শতাংশ যে সীমা আছে ব্যাংকিং কোম্পানি আইনে, ব্যাংকগুলো ক্যাপিটাল মার্কেটে তাদের দায়ের মোট ১০ শতাংশের বেশি এক্সপোজ করতে পারবে না। সেটির ব্যাপারে কমার্শিয়াল ব্যাংকগুলোকে রিপোর্ট করতে বলল বাংলাদেশ ব্যাংক। ফলে বাজারে খবর গেল যে ব্যাংকগুলোকে তাদের ব্যালেন্স সমন্বয় করতে বলা হয়েছে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে। কিন্তু পরবর্তী সময় বাংলাদেশ ব্যাংক জানিয়েছে, তারা শুধু রিপোর্ট করতে বলেছে। কিন্তু রিপোর্ট করার পর একটা সময় অবশ্যই হিসাবের সমন্বয় করতে হবে, তা না হলে তো রিপোর্ট করার কোনো উদ্দেশ্য হয় না। এ কারণে শেয়ারবাজারে একটি শঙ্কা সৃষ্টি হয় যে বাংলাদেশ ব্যাংক হয়তো খুব একটা বড় রকম বিপরীত নীতি অনুসরণ করবে। আরেকটি বিষয় হলো, বাংলাদেশ ব্যাংক ক্যাশ রিজার্ভ রিকয়ারমেন্ট (বিধিবদ্ধ জমার নগদ অংশ-সিআরআর) ৫ দশমিক ৫ থেকে বাড়িয়ে ৬ করেছে। এর ফলে একটি সতর্কবার্তা যাচ্ছে শেয়ারবাজারে। সেটি গাণিতিক দিক থেকে দেখলে এর কোনো প্রভাব পড়ার কথা নয় শেয়ারবাজারে। কারণ এই ৫ দশমিক ৫ থেকে ৬ করার ফলে বাংলাদেশ ব্যাংক আড়াই হাজার কোটি টাকার মতো মপ-আপ করেছে, আবার এক দিন পর সাত হাজার কোটি টাকা রেপো করে তারা মার্কেটে ইনজেক্ট করেছে। সুতরাং অঙ্কের দিক থেকে কোনো প্রভাব না থাকলেও সতর্কবার্তা হিসেবে প্রভাব পড়ছে শেয়ারবাজারে।

এ বি মির্জ্জা আজিজুল ইসলাম

> যত দ্রুত সম্ভব সরকারি শেয়ারগুলো বাজারে আনা দরকার। আশার কথা হচ্ছে, বেশ কয়েকটি ভালো প্রাইভেট কোম্পানির শেয়ার পাইপলাইনে আছে। এসইসির মূল দায়িত্বের প্রতি বেশি মনোযোগী হওয়া উচিত।

শেয়ারবাজারে দীর্ঘ মেয়াদে স্থিতিশীলতা ধরে রাখার জন্য একটি খারাপ সংকেত হচ্ছে, নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থাগুলো বাজার ধরে রাখার দায়িত্ব নিচ্ছে। আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি, এটি নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থাগুলোর মূল দায়িত্ব নয়। তাদের মূল দায়িত্ব হচ্ছে, বাজার যেন সুচারুভাবে পরিচালিত হয়, সেটা দেখা এবং এর জন্য প্রয়োজনীয় বিধিমালা বা নীতিমালা প্রণয়ন করা। ব্রোকারদের মার্জিন পেমেন্ট, যেটির সীমা ছিল পাঁচ কোটি টাকা। এটা বাড়িয়ে ১৫ কোটি টাকা করা হয়েছে। এসব করার ফলে বাজারে একটি বার্তা যাচ্ছে, নিয়ন্ত্রণ সংস্থাগুলো সূচক ধরে রাখার চেষ্টা করছে। এর ফলে দুই ধরনের প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়। বিনিয়োগকারীদের মধ্যে অনিশ্চয়তা জাগে যে নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থাগুলো এ ধরনের একটা সিদ্ধান্ত নিয়েছে আজ, কাল আবার কী হবে, তা তাঁরা তো জানেন না। দ্বিতীয়ত, কিছু কিছু বিনিয়োগকারীকে ঝুঁকিপূর্ণ বিনিয়োগের দিকে উৎসাহিত করে। কারণ, তাঁদের মধ্যে যদি এ ধারণাটি জন্মে যে যদি সূচক কমেও, তবে নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থাগুলো তা ঠেকানোর জন্য পদক্ষেপ নেবে। ফলে অর্থনীতির ভাষায় এ ধরনের পরিস্থিতিকে ‘মোরাল হেজার্ড’ বলা হয়। সে ধরনের পরিস্থিতি আমাদের শেয়ারবাজারে প্রচণ্ডভাবে আস্থার সংকট তৈরি করেছে।

আমি মনে করি, এসইসির মূল দায়িত্ব হচ্ছে, বাজার সুচারুভাবে পরিচালিত হচ্ছে কি না, তা দেখা। আর বাজারে কোনো ম্যানিপুলেশন আছে কি না, অবশ্যই তা দেখার ক্ষমতা আছে এসইসির। এর জন্য ব্রোকার হাউস, মার্চেন্ট ব্যাংক কিংবা মিউচুয়াল ফান্ড—সবারই ট্রেডিং বিহেভিয়ার পর্যবেক্ষণ করার ক্ষমতা রয়েছে এসইসির। নিয়মভঙ্গকারীদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থাও নিতে পারে এসইসি।

ফারুক আহমেদ সিদ্দিকী চেয়ারম্যান থাকা অবস্থায় একটি প্রতিষ্ঠানকে ১০ কোটি টাকা জরিমানা করা হয়েছিল এবং তা আদায়ও করা হয়েছিল। কাজেই তাদের সেই ক্ষমতাগুলো ব্যবহার না করে সূচক নিয়ে দৈনন্দিন যে পদক্ষেপ তারা গ্রহণ করছে, কোনো সময় বাড়ানো বা কমানোর জন্য। আমি মনে করি, এটি সঠিক নয়। বাজারকে কীভাবে দীর্ঘ মেয়াদে স্থিতিশীল করা যায়, সে জন্য সবার সম্মিলিত পদক্ষেপ নিতে হবে। স্বল্প মেয়াদে অনেক শেয়ারবাজারে উত্থান-পতন ঘটে। যেমন—মুম্বাই শেয়ারবাজারে সূচক প্রায় ১৯ হাজারে চলে গিয়ে আবার কমতে কমতে সাড়ে নয় হাজারে নেমে এসেছিল। এখন আবার সেটি ১৮-১৯ হাজারের কাছাকাছি চলে গেছে। কাজেই মধ্য মেয়াদে স্থিতিশীল পরিস্থিতি বজায় রাখার জন্য বেশ কিছু পদক্ষেপ নেওয়া জরুরি। প্রথম কথা হচ্ছে, শেয়ারের সরবরাহ বাড়াতে হবে। কারণ চাহিদা বাড়লেও নতুন নতুন ভালো শেয়ারের সরবরাহ বাড়েনি। গত দুই বছরে গ্রামীণফোন ছাড়া বড় তেমন কোনো কোম্পানির শেয়ার বাজারে আসেনি। এর ফলে এ ধরনের একটি অসামঞ্জস্য দেখা যাচ্ছে চাহিদা ও সরবরাহের মধ্যে। বাজারে সরকারি শেয়ার আনার বিষয় বেশ আলোচিত হচ্ছে। আমি মনে করি, যত দ্রুত সম্ভব সরকারি শেয়ারগুলো বাজারে আনা দরকার। আশার কথা হচ্ছে, বেশ কয়েকটি ভালো প্রাইভেট কোম্পানির শেয়ার পাইপলাইনে আছে। এসইসির তাদের মূল দায়িত্বের প্রতি বেশি মনোযোগী হওয়া উচিত। বিনিয়োগকারীদের প্রশিক্ষিত করার মাধ্যমে সচেতন করার জন্য ব্যবস্থা নেওয়া উচিত। এ ক্ষেত্রে গণমাধ্যমগুলো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। ডিএসই ও এসইসি মিলিতভাবে প্রতিদিন যদি গুরুত্বপূর্ণ দু-একটি সূচকের তথ্য গণমাধ্যমগুলোর মাধ্যমে প্রচার করে, তবে বিনিয়োগকারীরা আরও বেশি সচেতন হতে পারেন। এটিও তাদের বলা যায়, আপনার কাছে যদি ভালো কোনো শেয়ার থাকে, তা এই মুহূর্তে বিক্রি করার দরকার নেই, মার্কেটে দরপতন হলেও কিছুদিন পর এটির দাম বাড়ার সম্ভাবনা আছে—এ ধরনের প্রচেষ্টা নেওয়া যেতে পারে।

প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগকারীদের সঙ্গে আরও বেশি আলোচনা করা দরকার, যাতে বাজারে স্থিতিশীল পরিস্থিতি সৃষ্টির জন্য ভূমিকা রাখতে পারে, সে বিষয়ে তাদের উদ্বুদ্ধ করা। আগামী তিন-পাঁচ বছর মেয়াদের মধ্যে শেয়ারবাজারকে ডিমিউচ্যুয়ালাইজেশন (মালিকানা ও ব্যবস্থাপনা পৃথক করা) করতে উদ্যোগী হওয়া উচিত। এসব ক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থা ও সরকারকে অনেকটা দৃঢ় অবস্থান নিতে হতে হবে। সিডিবিএল যখন প্রথম চালু করা হয়, তখন প্রচণ্ড বাধা এসেছিল। কিন্তু তখন আমি বলেছিলাম, যদি এর ফলে কোনো বিরূপ প্রতিক্রিয়া হয়, তার দায়িত্ব আমরা নেব। কিন্তু এটি এখন ভালোভাবেই কাজ করছে।

প্রাইস আর্নিং অনুপাতের ক্ষেত্রে আরও বেশি সংশোধন করা দরকার। যখন একটি রিজনেবল লেভেলে পিই রেশিও আসবে, তখন ব্যক্তিগত ও প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগকারীরা শেয়ার কিনতে শুরু কিংবা বিক্রি কম করবে। নতুন শেয়ার এলে সূচক আবারও বাড়বে। কারণ সূচক বাড়ার দুটি সূত্র—একটি নতুন শেয়ার এলে, অপরটি বিদ্যমান শেয়ারের দাম বাড়া। সেটিও বিনিয়োগকারীদের জন্য আশামূলক পরিস্থিতি সৃষ্টি করবে নতুন শেয়ার বাজারে আসার ফলে। শেয়ারবাজারের প্রতি বিনিয়োগকারীদের আস্থা এখনো পুরোপুরি নষ্ট হয়ে যায়নি। কারণ যেগুলোকে সাবসক্রিপশনের আমন্ত্রণ করা হয়েছে, সেগুলোর তারিখ পার হয়ে গেছে, এখনো বাজারে আসেনি। সেগুলোর সবই তো তিন-চার গুণ ওভার সাবসক্রাইবড হতে দেখা যাচ্ছে। সুতরাং আমি মনে করি, বেসরকারি ও সরকারি খাত যদি এগিয়ে আসে, মূলধন জোগান দেওয়ার চিন্তা তারা করে, স্টক মার্কেটে সেটিকে কাজে লাগানো সম্ভব।

মতিউর রহমান

নতুন নতুন কোম্পানি শেয়ারবাজারে এসে টাকা নিয়ে চলে যাচ্ছে। যাদের দুই-তিন বছর আগেও তেমন কোনো সুনাম ছিল না। আর্থিক সচ্ছলতা-সংগতি তাদের ছিল না। ডিফল্টার হিসেবে তারা নানা কিছুর সঙ্গে যুক্ত ছিল। দেখা যাচ্ছে, তারাই নতুন নতুন কোম্পানি এনে, আরও একের পর এক কোম্পানি কিনে, আবার শেয়ারবাজারে এসে বাজারের সূচক বৃদ্ধি করছে। এদের মধ্যে অনেকে ’৯৬-এ শেয়ারবাজারে কেলেঙ্কারির সঙ্গে যুক্ত ছিল। তিনটি সরকার ক্ষমতায় ছিল, তারা কেউই এদের বিরুদ্ধে কোনো শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নিতে পারেনি। অনেকে বলছেন, এরাই এখনো শেয়ারবাজারকে এই পরিস্থিতির দিকে নিয়ে যাচ্ছে। এ বিষয়গুলো আমাদের সবার কাছে পরিষ্কার। আলোচনার এ পর্যায়ে বিশিষ্ট শিল্পপতি ও তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সাবেক উপদেষ্টা সৈয়দ মঞ্জুর এলাহীকে বলার জন্য অনুরোধ করছি।

সৈয়দ মঞ্জুর এলাহী

আমরা যাঁরা ব্যবসায়ী, স্টক মার্কেটে আইপিও করতে আসি, এর পেছনে দুটি উদ্দেশ্য থাকে। একটি হলো, বিদ্যমান মূলধন ভিত্তিকে শক্তিশালী করা। আর দ্বিতীয়টি হচ্ছে, উত্তোলিত মূলধনের মাধ্যমে ঋণ পরিশোধ করে কোম্পানির ব্যয় কমিয়ে আনা। আমি ব্যাংক থেকে ঋণ নিতে পারি, কিন্তু তার ফলে আমার দেনার পরিমাণ বেড়ে যায়। তাই আমরা কোম্পানি সম্প্রসারণের জন্য শেয়ারবাজার থেকে অর্থ সংগ্রহ করতে আইপিও করি। ফাটকাবাজি বিনিয়োগকারী বলতে বোঝায়, আমি বাজারে এসে বাজারকে চড়িয়ে দিয়ে শেয়ার বিক্রি করে দিয়ে কেটে পড়লাম। কিন্তু বর্তমানে শেয়ার মার্কেট এত সম্প্রসারিত হয়েছে যে আমার মনে হয় না একটা কোম্পানি এসে বাজার নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। ’৯৬ সালে শেয়ারবাজারের পরিধি অনেক ছোট ছিল। কিন্তু বর্তমানের সঙ্গে তাকে তুলনা করলে হবে না। ফলে কোনো কোম্পানির একার পক্ষে বাজারকে অস্থিতিশীল করা সম্ভব নয়। আর যদি কোনো কোম্পানি করেও থাকে, সেখানে এসইসি একটি বড় ধরনের ভূমিকা পালন করতে পারে। শেয়ারগুলো প্রকৃত মূল্যায়িত না হয়ে অতিমূল্যায়িত হয়েছে। উদাহরণ হিসেবে বলতে পারি, আমার দেখা একটি লেদার কোম্পানির শেয়ারের মূল্য ৩০ টাকা, যেটি অতিমূল্যায়িত হয়ে ৬০০ টাকা পর্যন্ত হয়েছিল। কিন্তু এটি সহজে বের করা সম্ভব। এই শেয়ারগুলো কোন ব্রোকার হাউসগুলো বা কারা কিনেছেন, তা কিন্তু এসইসি চিহ্নিত করে প্রকৃত কারণ বের করতে পারে। আমাদের দেশে প্রায় ২৯টির মতো প্রাইভেট কমার্শিয়াল ব্যাংক রয়েছে। এর মধ্যে সাত-আটটি ব্যাংক আলাদা কোম্পানি করেছে, যেটি বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্দেশ ছিল যে আলাদা একটা সাবসিডিয়ারি কোম্পানি করতে হবে। তার পেইডআপ ক্যাপিটাল ১০০ বা ২০০ কোটি টাকা হলেও তার ব্যালান্সশিট আলাদা করতে হবে, যা বাংলাদেশ ব্যাংক আলাদাভাবে পর্যবেক্ষণ করতে পারে। কিন্তু ব্যাংকগুলো প্রধান ব্যালান্সশিট থেকে পুঁজিবাজারে বিনিয়োগ করছে, যা বাংলাদেশ ব্যাংক তদারকি করতে পারছে না। আমার জানা মতে, আটটি ব্যাংক আলাদা সাবসিডিয়ারি করে গড়ে ১৫০-২০০ কোটি টাকা করে, প্রায় এক-দেড় হাজার কোটি টাকা শেয়ার মার্কেটে এনেছে। কিন্তু আজকে সূচকের যে ওঠা-নামা হচ্ছে, তার পেছনে মূল হোতা হচ্ছে কালো টাকা। কারণ, কালো টাকাটি তারা ব্যাংকে রাখতে পারছে না, কর দিতে হবে বলে। টাকাটা বাসায় রাখতে পারছে না আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি অবনতির কারণে। তখন সে এই কালো টাকাটা শেয়ারবাজারে খাটাচ্ছে। এই টাকাটা যখন বাজারে আসে, সেটা যদি গঠনমূলক খাতে যায়, তাহলে কোনো সমস্যা নেই। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে, সেই কালো টাকা বারবার শেয়ারবাজারে তারা নিয়ে আসছে, ফলে এই টাকা বারবার ব্যবহারের ফলে মার্কেট চড়া হচ্ছে। যদি আমাদের বাজারের নতুন ভালো কোম্পানির শেয়ার সরবরাহ বেশি থাকত, তবে বাজার মোটামুটি নিয়ন্ত্রণে থাকত। মুম্বাইয়ের শেয়ারবাজারে শেয়ারের মূল্য আয়ের অনুপাত (পিই রেশিও) প্রায় ২৮। আমাদের পিই রেশিও ২১ থেকে ২৫। আমাদের পিই রেশিওর পার্থক্য কিন্তু মুম্বাই শেয়ারবাজারের তুলনায় খুব বেশি নয়। সমস্যা হচ্ছে, তাদের ওই টাকাগুলো ভারতে শিল্প খাত ও উৎপাদনমূলক খাতে যাচ্ছে। কিন্তু আমাদের টাকা বারবার শেয়ারবাজারে ফিরে আসছে। আমাদের অর্থনীতি ভারতের মতো অত শক্তিশালী নয়। আমাদের এসইসিকে তদারকির ব্যবস্থা আরও বাড়াতে হবে—এই টাকাগুলো কোথা থেকে আসছে, কোথায় বিনিয়োগ হচ্ছে, এ বিষয়ে। জেড ক্যাটাগরির শেয়ারগুলো তদারকির ব্যবস্থা আরও বাড়াতে হবে। যেসব কোম্পানি ম্যানিপুলেট করছে, তাদের চিহ্নিত করে শাস্তির মুখোমুখি করতে হবে এসইসিকে। এ কাজগুলো কারা করছে, সবাই তা জানে। যেখানে অর্থমন্ত্রী নিজে বলেছেন, আমি জানি, এগুলো কারা করছে। তিনি জানার পরও যদি তাদের বিরুদ্ধে কোনো শাস্তিমূলক ব্যবস্থা না নেওয়া হয়, তবে আমাদের মতো সাধারণ মানুষের কী আর করার থাকে।

সৈয়দ মঞ্জুর এলাহী

> নিজের কোম্পানির শেয়ার ৩০ টাকাকে ৬০০ টাকা যারা করেছে, তাদের বিরুদ্ধে কেন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে না। সরকার ও নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থাগুলোকে যৌথভাবে সমন্বিত উদ্যোগ নিতে হবে এসব প্রতিরোধের জন্য।

দেশ আমাদের সবার। সুতরাং এ ধরনের কয়েকটি কোম্পানিকে যদি উদাহরণ সৃষ্টির জন্য শাস্তির ব্যবস্থা করা সম্ভব হয়, তবে অন্যরা সতর্ক হয়ে যাবে। একটি কোম্পানিকে যদি ১০ কোটি টাকা জরিমানা করা হয়, সেখানে ১০ কোটি টাকা বড় কথা নয়, বড় কথা হচ্ছে, সেই কোম্পানির নামটি গণমাধ্যমে প্রচার হলে তার কোম্পানির সুনাম নষ্ট হবে। একটি প্রাইভেট কোম্পানির সুনাম যদি খর্ব হয়, তবে ভবিষ্যতে তার পক্ষে শেয়ার মার্কেট থেকে টাকা তোলা খুব কঠিন হয়ে পড়বে। ব্যবসা পরিচালনার মূলকাঠি হচ্ছে সুনাম। আমি একদিকে বলছি মুক্তবাজার অর্থনীতির কথা, আবার অন্যদিকে সেটাকে নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করছি। এটা কিন্তু ঠিক নয়। সূচক বাড়ল না কমল, এটা কিন্তু এসইসির দেখা কাজ নয়। শেয়ারবাজারকে নিজস্ব গতিতে চলতে দেওয়া উচিত। কিন্তু যারা ম্যানিপুলেটরস, তাদের চিহ্নিত করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা করাই হচ্ছে এসইসির প্রধান কাজ। ১৯৯৬ সালে যারা শেয়ারবাজার কেলেঙ্কারির সঙ্গে জড়িত, তাদের বিরুদ্ধে প্রতিবেদনও তৈরি হয়েছিল এবং নামের তালিকাও করা হয়েছিল। কিন্তু আজ পর্যন্ত তাদের বিরুদ্ধে কোনো শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া সম্ভব হয়নি। মামলাগুলো আইনি জটিলতার কারণে হাইকোর্টে এখনো চলছে। কিন্তু কিছু কিছু অপরাধ আছে, যেগুলো প্রমাণিত হয়েছে, তাদের বিরুদ্ধে সরকারকে সাহস নিয়ে ব্যবস্থা নিতে হবে। যেমন—নিজের কোম্পানির শেয়ার ৩০ টাকাকে ৬০০ টাকা যারা করেছে, তাদের বিরুদ্ধে কেন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে না। সরকার ও নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থাগুলোকে যৌথভাবে সমন্বিত উদ্যোগ নিতে হবে এসব প্রতিরোধের জন্য।

আব্দুল কাইয়ুম

বাজারে শেয়ারের চাহিদা ও সরবরাহের মধ্যে সমন্বয় করার দায়িত্ব মূলত কার? গ্রাম ও মফস্বল থেকে বিনিয়োগকারীরা রাতারাতি লাভের আশায় বাজারে এসেছেন। এসব ক্ষেত্রে এসইসি কী ভূমিকা রাখতে পারে, সে বিষয়গুলো সম্পর্কে এসইসির সাবেক চেয়ারম্যান ফারুক আহমেদ সিদ্দিকীকে বলার জন্য অনুরোধ করছি।

যাঁরা অংশ নিলেন

এ বি মির্জ্জা আজিজুল ইসলাম
সাবেক অর্থ উপদেষ্টা, তত্ত্বাবধায়ক সরকার এবং সাবেক চেয়ারম্যান, সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (এসইসি)

সৈয়দ মঞ্জুর এলাহী
বিশিষ্ট শিল্পপতি ও সাবেক উপদেষ্টা, তত্ত্বাবধায়ক সরকার

ফারুক আহমেদ সিদ্দিকী
সাবেক চেয়ারম্যান, সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (এসইসি)

অধ্যাপক আবু আহমেদ
অর্থনীতিবিদ

সালাহউদ্দিন আহমেদ খান
সাবেক প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ (ডিএসই) ও অধ্যাপক ফাইন্যান্স বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

শাকিল রিজভী
সভাপতি, ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ (ডিএসই)

শেখ মর্তুজা আহমেদ
সভাপতি, বাংলাদেশ মার্চেন্ট ব্যাংকার্স অ্যাসোসিয়েশন

সূচনা বক্তব্য

মতিউর রহমান : সম্পাদক, প্রথম আলো

সঞ্চালক

আব্দুল কাইয়ুম : যুগ্ম সম্পাদক, প্রথম আলো

শওকত হোসেন : যুগ্ম বার্তা ও বাণিজ্য সম্পাদক, প্রথম আলো

ফারুক আহমেদ সিদ্দিকী

৫ ডিসেম্বর ডিএসইর সূচক সর্বোচ্চ উঠে দাঁড়িয়েছিল আট হাজার ৯১৮ এবং লেনদেন হয়েছিল তিন হাজার ২৫০ কোটি টাকা। লেনদেনের করা শেয়ারের সংখ্যা ছিল তিন লাখ ৯০ হাজার। কেন এই পর্যায়ে বাজারকে আসতে দেওয়া হয়েছিল? কেন বাজারকে এই পরিস্থিতিতে আসার আগে নিয়ন্ত্রণ করা হলো না? গতকাল সূচক ছিল সাত হাজার ১৪০ পয়েন্ট। ইতিমধ্যে প্রায় এক হাজার ৭৮০ পয়েন্টের মতো সংশোধিত হয়েছে। অর্থাৎ যা ২০ শতাংশের মতো প্রায় সংশোধিত হয়েছে, যার ফলে বাজারের ঝুঁকি কিছুটা কমেছে। তার পরও এখন যদি বাজার স্বাভাবিক গতিতে ফিরে আসে, স্বাভাবিকভাবে দাম যদি কিছুটা বাড়ে, বাজার সংশোধিত হয়, তাতে বিচলিত হওয়ার কিছু নেই। এখনো বাজার হঠাৎ হঠাৎ ওঠা-নামা করছে। বাজার তার স্বাভাবিক আচরণ করছে না। যেমন—গতকালই আবার বাজার বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। আজকে বেলা একটা পর্যন্ত বন্ধ রাখা হয়েছে। অর্থাৎ সংকটটা কিন্তু রয়েই যাচ্ছে।

যাঁরা বিশ্লেষক আছেন, তাঁরা অনেকে মূলধনের সংকটকে দায়ী করে কথা বলছেন। প্রথমে যখন বাজার নেমে যায়, তখন হয়তো অর্থসংকট একটা কারণ হতে পারে। কিন্তু মূলত এটা প্রধান কারণ নয়। কারণ, যখন এসইসি তাদের মার্জিন পয়েন্ট ৫ করেছে, এনইভির তখন প্র্যাকটিক্যাল রেট ছিল দশমিক ২৫। ক্রেডিট কিন্তু খুবই কমিয়ে নিয়ে আসা হয়েছিল, তখনো বাজারের ঊর্ধ্বগতি থামেনি। বাজারে অর্থের সমস্যা হলেই যে বাজার নামবে বা বাড়বে, তা কিন্তু নয়। অর্থ একটি কারণ হতে পারে। কিন্তু মূলত বাজার এমন একটি পর্যায়ে গিয়েছিল যে অনিবার্যভাবে একটা সংশোধন দরকার ছিল। সে সংশোধনটা যদি ধীরে ধীরে হতো, তাহলে ভালো হতো। কিন্তু বিরাট ওঠা-নামার মধ্য দিয়ে এই সংশোধনটা হচ্ছে, যা অনেক বিনিয়োগকারীর জন্য ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। বর্তমানে এ সমস্যার মূল কারণ হচ্ছে, আস্থার সংকট। শেয়ারবাজারে একটি আস্থার সংকট সৃষ্টি হয়েছে। যদি আমি এখন বিনিয়োগ করি, তবে বাজারে আবারও দরপতন ঘটতে পারে। সুতরাং তাঁরা বিনিয়োগে যাচ্ছেন না।

এই বাজারে আস্থা ফিরিয়ে নিয়ে আসাই হবে আমাদের প্রধান কাজ। ঋণ অনুপাত বাড়িয়ে ১:২ করা হয়েছে, তবুও কোনো লাভ হয়নি। বাংলাদেশ ব্যাংক আইসিবিকে ২০০ কোটি টাকা দিয়েছিল, গতকাল আবারও ২০০ কোটি টাকা দিয়েছে। আমার মনে হয়, এগুলো খুব পরিণত সিদ্ধান্ত নয়। কারণ, ২০০ বা ৪০০ কোটি টাকা দিয়ে এই বাজারকে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব নয়। এ বাজারকে নিয়ন্ত্রণ করতে হলে প্রথমে বাজারে আস্থা ফিরিয়ে আনতে হবে, যা খুবই কঠিন ও দুরূহ কাজ। তবে সবাই সম্মিলিতভাবে কাজ করলে অবশ্যই এই আস্থা ফিরিয়ে আনা সম্ভব। শেয়ারবাজার-সংশ্লিষ্ট যাঁরা আছেন, তাঁদের প্রত্যেকেরই তাঁদের মন্তব্য সম্পর্কে একটু সচেতন হওয়া উচিত। আমরা এমন কিছু যেন না বলি, যাতে আস্থার সংকটটা আরও বাড়ে। বাজারকে তার নিজস্ব ধারায় চলতে দেওয়া উচিত, যাতে বাজারে স্থিতিশীল পরিবেশ ফিরে আসে। এখন বাজার খুবই নাজুক অবস্থায় আছে। সামান্য নেতিবাচক মন্তব্যের কারণেও কিন্তু বাজার পড়ে যেতে পারে। সুতরাং, আমরা কী বলছি সে ব্যাপারে সতর্ক হওয়া উচিত। যারা বাজার উঠিয়ে একটি পর্যায়ে নিয়ে শেয়ারগুলো বিক্রি করে দিয়েছে। ফলে যারা দেরিতে বাজারে এসেছে, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীরা এই শেয়ারগুলো কিনেছে। যখন শেয়ারের দাম কমে গেল, তখন সরকার ও নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থাগুলোর উদ্যোগে আবার বাজারকে চাঙা করা হলো। তখন সেই বড় বিনিয়োগকারীরা সুযোগ পেয়ে বাজার থেকে বেরিয়ে গেছেন। শেয়ারগুলো বড় বিনিয়োগকারীদের কাছ থেকে ক্ষুদ্র বিনিয়োগকারীদের হাতে চলে গেল। সুতরাং, এখানে নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থাগুলোর সতর্ক থাকা উচিত। তারা যেসব পদক্ষেপ নিয়ে বাজার চাঙা করার চেষ্টা করছে, এর ফলে শেয়ারগুলো কারা কিনছে। শেয়ারগুলো কারও না কারও হাতে আছে। আমার ধারণা, ইতিমধ্যে বড় বিনিয়োগকারী

ফারুক আহমেদ সিদ্দিকী

> বড় বিনিয়োগকারীরা ক্ষুদ্র বিনিয়োগকারীদের ওপর শেয়ারগুলো চাপিয়ে দিয়ে বের হয়ে গেছে। বাজার স্থিতিশীল করার জন্য আস্থা ফিরিয়ে আনতে হবে। এসইসি, বাংলাদেশ ব্যাংক, বিনিয়োগকারীসহ সবার সম্মিলিত উদ্যোগই পারে এই আস্থা ফিরিয়ে আনতে।

এর পর পৃষ্ঠা ২৭